নূতন পাঠ

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম্. এ., বি. এল্., প্রণীত

হেয়ার প্রেস—কলিকাতা

১৩০১

সূচীপত্র।

প্রথম পাঠ।

দ্বিতীয় পাঠ।

(১)

(২)

তৃতীয় পাঠ।

চতুর্থ পাঠ।

পঞ্চম পাঠ।

ষষ্ঠ পাঠ।

সপ্তম পাঠ।

অষ্টম পাঠ।

নবম পাঠ।

প্রথম পাঠ।

[বায়ু—জল—তাপ—আলোক]

পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির জীবন আছে; আর কতকগুলির জীবন নাই। যে সকল পদার্থের জীবন আছে, তাহাদিগকে সজীব পদার্থ বলে; যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ ইত্যাদি। যে সকল পদার্থের জীবন নাই, তাহাদিগকে নির্জীব পদার্থ বলে; যথা মৃত্তিকা, প্রস্তর, বায়ু, জল ইত্যাদি।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পদার্থের জীবনধারণের জন্য বায়ু, জল, উত্তাপ, আলোক ও

খাদ্য আবশ্যক। কোন কোন প্রাণী নিবিড় অন্ধকারে বাস করে; কোন কোন উদ্ভিদেরও আলোকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এরূপ সজীব পদার্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

বায়ু।

বায়ু, জল, উত্তাপ, আলোক ও খাদ্য এই সকলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বায়ু আবশ্যক। তৃষ্ণায় কিছুক্ষণ জল না পাইলে, ক্ষুধায় কিছুক্ষণ খাইতে না পাইলে, অথবা কিছুক্ষণ হিমে বা অন্ধকারে থাকিলে, প্রাণিগণ বাঁচিতে পারে; কিন্তু বায়ু না পাইলে অনেক প্রাণী মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। জলের ভিতর মৎস্য প্রভৃতি যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস আছে; অতএব তাহাদেরও বায়ু আবশ্যক। তোমরা বোধ হয় মনে কর যে জলের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু তাহা নহে। জলের ভিতরও বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে।

জীবনধারণের নিমিত্ত বায়ু কত আবশ্যক, তাহা বুঝিলে। ঈশ্বরের কৃপায় এই বায়ু আমাদিগকে খুঁজিয়া বা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় না। পৃথিবীর উপরিভাগে তিনি যে বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাণিগণ তাহার

মধ্যে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। অতএব তাহাদের কখনই বায়ুর অভাব হয় না।

বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না; শরীরে লাগিলে উহার অনুভব হয়। বায়ু কখন কখন এত মৃদুভাবে বহে, যে শরীরে লাগিতেছে বলিয়াও বোধ হয় না; আবার কখন কখন এত প্রবলবেগে বহে যে বাড়ী, ঘর, গাছপালা পড়িয়া যায়। প্রবল বায়ুকে ঝড় বলে।

জল।

ক্ষুধায় অধিকক্ষণ আহার না পাইলে যত কষ্ট হয়, তৃষ্ণায় অধিকক্ষণ জল না পাইলে তদপেক্ষা বেশী কষ্ট হয়। সকল সজীব পদার্থেরই জল আবশ্যক। মৎস্য ত জলের মধ্যেই বাস করে; জল হইতে তুলিলে প্রায় কোন মৎস্যই অধিকক্ষণ বাঁচে না। বৃক্ষ, লতা, তৃণ প্রভৃতি উদ্ভি-দেরও জল আবশ্যক; জল না পাইলে উহারা শুকাইয়া যায়। যেখানে জল নাই, সেখানে কোন প্রাণীও বাঁচে না, উদ্ভিদ্ও জন্মে না। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রচুর জল দিয়াছেন। নদী, বিল প্রভৃতি জলাশয় পৃথিবীর অনেক স্থানেই আছে। বৃষ্টির জলে সেই সকল জলাশয় পূর্ণ হয়। সমুদ্রের সীমা নাই বলিলেই হয়।

কিন্তু উহার জল লবণাক্ত, পান করা যায় না। সমুদ্রের জলে স্নান করিলে শরীরের উপকার হয়।

বায়ু যেমন সকল স্থানেই আছে, জল তেমন নাই; বায়ু যেমন সর্ব্বত্র বিনা আয়াসে ও বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়, জল তেমন পাওয়া যায় না। যে সকল স্থানে নদী, বিল প্রভৃতি নাই, তথায় কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিয়া লইতে হয়। ঈশ্বরের কৃপায় অনেক স্থানে মাটিতে এত জল থাকে যে, নীচের দিকে প্রয়োজনমত কিছুদূর খনন করিলেই জল উঠিয়া কূপ ও পুষ্করিণী হয়। আমাদের প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী আছে। বৃহৎ পুষ্করিণীকে দীর্ঘিকা বা দীঘি বলে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশী পুষ্করিণী নাই, বিস্তর কূপ আছে। কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিতে অর্থ আবশ্যক। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদের কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় খনন করাইয়া দেওয়া উচিত। যিনি তৃষ্ণার্ত্তকে জল দেন, ভগবান তাঁহার মঙ্গল করেন।

তাপ।

তাপ না পাইলে অনেক পদার্থ জীবিত থাকিতে পারে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে শীত অত্যন্ত অধিক এবং বরফ পড়ে, তথায় দুঃখী লোকে বরফের উপর

দিয়া চলিতে চলিতে কখন কখন হিমে অভিভূত হইয়া মরিয়া যায়। কখন কখন পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীকেও ঐরূপে মরিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। বেশী হিমে অনেক বৃক্ষ, লতা, তৃণ প্রভৃতিরও অনিষ্ট হয়। বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে আমাদের দেশে শীতকালে গাছপালার তেমন তেজ থাকে না।

আমরা চিরকালই সূর্য্য হইতে তাপ পাইতেছি। সে তাপ ক্রয় করিয়া লইতে হয় না। বায়ুও যেমন বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়, সূর্য্যের তাপও তেমনি বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু সে তাপ পৃথিবীর সকল স্থানে সমান নহে। আমাদের দেশে সূর্য্য হইতে যত তাপ পাওয়া যায়, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এত শীত যে, কেবল গরম কাপড় ব্যবহার করিলে তাহার নিবারণ হয় না, অনেক সময় রাত্রিকালে, এবং কখন কখন দিবাভাগেও গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হয়; নচেৎ অতিরিক্ত হিমে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিবার জন্য কয়লা আবশ্যক। কয়লা কিনিতে অর্থ ব্যয় হয়। আমাদের দেশেও গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তাপ যত প্রখর হয়, শীতকালে তত হয় না। এই জন্য লোকে শীতকালে অর্থ ব্যয় করিয়া শীতবস্ত্র ক্রয় করে। দুঃখী লোকদিগকে শুষ্ক গোময়,

কাষ্ঠ ও বৃক্ষপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা প্রাতঃ-কালে ও রাত্রিতে অগ্নি জ্বালিয়া শরীর গরম করিতে হয়।

অতএব বুঝিতে পারিতেছ, জলও যেমন অনেক স্থানে বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় না, তাপও তেমনি অনেক স্থানে বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় না। শীতে দুঃখী লোকে বড়ই কষ্ট পায় ও নানা পীড়াগ্রস্ত হয়। যিনি দুঃখীকে শীতবস্ত্র দেন, ভগবান তাঁহার মঙ্গল করেন।

আলোক।

পণ্ডিতেরা বলেন যে আলোক না পাইলে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সজীব পদার্থের অনিষ্ট হয়। আমরাও দেখিতে পাই যে, যখন আকাশ একাদিক্রমে পাঁচ সাত দিন, কি দশ পনর দিন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, রীতিমত সূর্য্যের আলোক পাওয়া যায় না, তখন আমাদের শরীরও ভাল থাকে না, মনও ভাল থাকে না। সকলেই যেন জড়সড় হইয়া পড়ে; কাহারও স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না।

আলোক না পাইলে, অনেক গাছপালাও বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং ভাল জন্মে না। যে গাছ বেশী আলোক পায়, তাহা যেমন বাড়ে, যে গাছ কম আলোক পায় তাহা তেমন বাড়ে না। একটা ছোট গাছের উপর একটা

বড় গাছের ডাল আসিয়া পড়িলে, ছোট গাছটী বড় গাছের ছায়ায় থাকিয়া ভাল রূপ আলোক পায় না; এবং সেই জন্য ভাল বাড়িতে পারে না। এই কারণে আমাদের দেশের লোকে বলিয়া থাকে যে 'আওতায়' গাছ ভাল হয় না।

মৎস্য প্রভৃতিরও আলোক আবশ্যক। আলোকে উহাদের বেশ স্ফূর্ত্তি হয়। যখন বৃষ্টি হয়, কিম্বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখন মৎস্যেরা খেলাইয়া বেড়ায় না, নদী বা পুষ্করিণীর তলভাগে গিয়া প্রায় স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু যখন মেঘ কাটিয়া যায়, ও বেশ রৌদ্র হয়, তখন আলোক দেখিয়া তাহাদের এত স্ফূর্ত্তি জন্মে যে, তাহারা তলদেশ ছাড়িয়া চারিদিকে খেলা করিতে থাকে। যাহারা ছিপ দিয়া মাছ ধরে, তাহারা এই জন্য বলিয়া থাকে যে মেঘ বা বৃষ্টির পর যখন রৌদ্র হয়, তখনই 'চারে' খুব মাছ আইসে।

দ্বিতীয় পাঠ।

(১)

[খাদ্য—উদ্ভিদ—কৃষিকার্য্য]

খাদ্য।

সমস্ত সজীব পদার্থেরই খাদ্য আবশ্যক। খাদ্য না পাইলে তাহারা শুষ্ক বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে মরিয়া যায়। আর খাদ্য পাইলে তাহাদের বেশ পুষ্টি ও শ্রী হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সজীব পদার্থ; খাদ্য না পাইলে ইহারা বাঁচে না। বোধ হয় গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল এই সকল পশুকে এবং কাক, চিল, শালিক, চড়াই এই সকল পাখীকে

সমস্ত দিনই খাইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছ। মানুষকেও প্রতিদিন দুইবার, তিনবার, চারিবার খাইতে হয়। কোন দেশের লোক দুইবার খায়, কোন দেশের লোক তিনবার খায়, কোন দেশের লোক চারিবার খায়। কিন্তু অনেক হিন্দু বিধবা এবং উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের অনেক লোক একাহারী। বালক বালিকারা, সকল দেশেই, যতবার ইচ্ছা, খাইয়া থাকে। সর্প, ভেক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী শীতকালে তিন চারি মাস কিছুই খায় না; কিন্তু গ্রীষ্ম আরম্ভ হইলে উহারাও ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠে, এবং খাদ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপন আপন বিবর বা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য।

খাদ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার; উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ। ফল, মূল, শাক, বীজ প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্য উদ্ভিদ হইতে অর্থাৎ বৃক্ষ, লতা, তৃণ প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। অতএব উহাদিগকে উদ্ভিজ্জ খাদ্য বলা যায়। আর মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্য প্রাণিশরীর হইতে অর্থাৎ গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস প্রভৃতি প্রাণী হইতে পাওয়া যায়; অতএব ঐ গুলিকে প্রাণিজ খাদ্য বলা যায়। দুগ্ধও প্রাণিশরীর হইতে পাওয়া যায়। গাভী হইতে দুগ্ধ দোহন করিতে অবশ্যই

দেখিয়াছ। অতএব দুগ্ধও প্রাণিজ খাদ্য। কিন্তু এদেশে লোকে মৎস্য বা মাংসকে যে প্রকার প্রাণিজ খাদ্য মনে করে, দুগ্ধকে সে প্রকার মনে করে না। কতকগুলি জন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায়, যথা গো, মেষ, মহিষ, ছাগল, হরিণ; কতকগুলি জন্তু প্রাণিজ খাদ্য খায়, যথা সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কুম্ভীর। মনুষ্য, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ, দুই প্রকার খাদ্যই খায়। কিন্তু সকল মনুষ্যই যে সকল প্রকার খাদ্য খায় তাহা নহে। আমাদের দেশের অনেক বিধবা ও বৈষ্ণব এবং উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ মৎস্য মাংস খায় না।

প্রাণিজ খাদ্যও এক হিসাবে উদ্ভিজ্জ খাদ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বাঘে হরিণ খায় বটে, কিন্তু হরিণে লতা, পাতা, ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করে। অতএব বাঘে যাহা খায় গোড়ায় তাহাও উদ্ভিজ্জ। তেমনি গোদুগ্ধ এক হিসাবে প্রাণিজ খাদ্য, কারণ গাভীর শরীর হইতে উহা পাওয়া যায়; কিন্তু আর এক হিসাবে উহা উদ্ভিজ্জ খাদ্য, কারণ খোল, বিচালি, ঘাস, খড় প্রভৃতি না খাইলে গরুর দুধ হয় না। অতএব প্রাণীদিগের যে সকল খাদ্য দেখিতে প্রাণিজ, প্রকৃত-পক্ষে তাহাও উদ্ভিদ হইতে আইসে।

উদ্ভিদ।

জীবন-ধারণের জন্য উদ্ভিদ কত আবশ্যক তাহা দেখিলে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদেরও জীবন আছে; মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদ্‌ও জন্ম গ্রহণ করে, ক্রমে ক্রমে বড হয়, এবং অবশেষে মরিয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যেমন এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে পারে, অধিকাংশ উদ্ভিদ তেমন পারে না, যেখানে জন্মে সেই খানেই থাকে। সমুদ্রের ভিতর এমন উদ্ভিদ আছে, যাহা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গিয়া থাকে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় জীবন থাকিলেও উদ্ভিদকে প্রাণী বলে না। কেবল মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতিকেই প্রাণী বলে।

প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরও খাদ্য আবশ্যক। কিন্তু প্রাণিগণ যেমন মুখ দিয়া খায়, উদ্ভিদ তেমন খায় না। মৃত্তিকায় জল থাকে, এবং সেই জলে লবণ প্রভৃতি অনেক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। উদ্ভিদ শিকড় দিয়া সেই সমুদায় টানিয়া লয়। পত্র দ্বারাও ইহারা বায়ু হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। এইরূপে উদ্ভিদের পুষ্টি হয়।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই উদ্ভিদ জন্মে; কিন্তু

সকল স্থানে সমান হয় না। যেখানে গ্রীষ্ম অধিক, অথচ বায়ু ও ভূমি শুষ্ক নহে, সেখানে উদ্ভিদ বেশী জন্মে; আর যেখানে শীত অধিক এবং বায়ু ও ভূমি শুষ্ক, সেখানে উদ্ভিদ ভালও হয় না, বেশী ও হয় না। মরুভূমিতে উদ্ভিদ একেবারেই হয় না।

অশ্বত্থ, বট, আম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছ দেখিয়াছ। উহারা কত বড় বল দেখি। হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি যে সকল প্রাণী খুব বড়, তাহারাও এই সকল গাছের তুলনায় খুব ছোট। কিন্তু গাছ কত ছোট হয় তাহা বোধ হয় জান না। তোমরা হয়ত মনে কর যে, দূর্ব্বাঘাসের ন্যায় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আর নাই। কিন্তু তাহা নহে। উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র আছে যে, চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে বোধ হয় দেখিয়াছ যে বাড়ীর উঠান পিছল হইয়াছে, কিংবা প্রাচীরের স্থানে স্থানে সবুজ দাগ ধরিয়াছে; হয়ত কখন মনে কর নাই যে, এ পিছল বা সবুজ জায়গায় কোন রকম উদ্ভিদ আছে। কিন্তু অণুবীক্ষণ নামক যে যন্ত্রে খুব ছোট জিনিসও বড় দেখায়, সেই যন্ত্র দিয়া দেখিলে জানা যায় যে ঐ পিছল বা সবুজ জায়গায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ রহিয়াছে।

বটবৃক্ষ প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ শত শত বৎসর বাঁচে; কোন প্রাণীই ততদিন বাঁচে না।

যে সকল বৃক্ষ দীর্ঘজীবী তাহাদের প্রতিবৎসর নূতন পাতা, নূতন ফুল, নূতন ফল হয়। কিন্তু এমন কতক-গুলি উদ্ভিদ আছে যাহারা ফল পাকিবার পরেই মরিয়া যায়, যেমন ধান, গম, যব, মটর। ইহাদিগকে ওষধি বলে। ধান, মটর প্রভৃতি শস্য আমাদের জীবন ধারণের জন্য যত আবশ্যক, আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষের ফল তত আবশ্যক নহে। অর্থাৎ ধান প্রভৃতি শস্য হইতে আমরা যত খাদ্য পাই,ঐ সকল ফল হইতে তাহার শতাংশের একাংশও পাই না। শস্য পাইতে হইলে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন। অতএব কৃষিসম্বন্ধে এখন দুই চারিটী কথা শুন।

কৃষিকার্য্য।

তোমরা পড়িয়াছ যে, মাটিতে যে জল থাকে এবং সেই জলে লবণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে যে,ধান্য প্রভৃতি শস্য ভালরূপ উৎপাদন করিতে হইলে গুটিকতক জিনিস আবশ্যক।

উর্ব্বরা ভূমি।

প্রথম উর্ব্বরা ভূমি। যে ভূমিতে ধান্য প্রভৃতি শস্যের গাছ, বা আম্র প্রভৃতি ফলের গাছ খুব বাড়ে,

এবং বেশী শস্য বা ফল প্রদান করে, তাহাকে উর্ব্বরা ভূমি কহে। গাছপালা যত খাদ্য পায়, ততই বাড়ে। অতএব যে ভূমিতে শস্যের গাছ বা অন্য গাছ বেশী খাদ্য পায়, তাহাই উর্ব্বরা ভূমি; এবং যে ভূমিতে শস্যের গাছ বা অন্য গাছ বেশী খাদ্য পায় না, তাহাই অনুর্ব্বরা ভূমি।

কিন্তু সকল প্রাণীর খাদ্য যেমন এক নয়, সকল গাছের খাদ্যও তেমনি এক নয়। কোন গাছ ছাই পাইলে বেশ বাড়ে, কোন গাছ গোবর পাইলে বেশ বাড়ে, কোন গাছ খোল পাইলে বেশ বাড়ে। কোন্ শস্যের গাছ কোন্ পদার্থ পাইলে ভাল জন্মে, কৃষকেরা তাহা জানে।

(সার)

উদ্ভিদের খাদ্য প্রধানতঃ ভূমিতেই থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ খাদ্য যত টানিয়া লয়, খাদ্যের পরিমাণ তত কমিয়া যায়। গাছের পাতা প্রভৃতি মাটিতে পড়িয়া পচিলে তাহাতেই আবার গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু শস্য পাকিলে কৃষকেরা শস্যের গাছসুদ্ধ কাটিয়া গৃহে লইয়া যায়। সুতরাং বনে যেমন গাছ পাতা প্রভৃতি পচিয়া নূতন উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হয়, শস্যক্ষেত্রে সেরূপ ঘটিতে পারে না। এই নিমিত্ত পুনর্ব্বার শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কৃষককে ক্ষেত্রে সার দিতে হয়।

ক্ষেত্রে শস্যের খাদ্যের অভাব হইলে, সার দিলে সে অভাব আর থাকে না, পূরণ হইয়া যায়। সার না দিলে শস্যের গাছের খাদ্য ক্রমেই কমিয়া আইসে; অতএব শস্যও ক্রমে কম হইতে থাকে। পচা পাতা, গোবর, খোল, কলার বাস্নার ছাই প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আমাদের দেশের চাষারা সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

(পলি)

কোন কোন স্থলে ক্ষেত্রে সার না দিলেও চলে। যে ক্ষেত্র বর্ষাকালে বন্যার জলে ডুবিয়া যায়, তাহাতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ বন্যার জলের সঙ্গে মাটি, এবং উদ্ভিদে খাইতে পারে এমন অনেক পদার্থ ধুইয়া আইসে। বন্যার জল কমিয়া গেলে দেখা যায় যে ক্ষেত্রের উপর দুধের সরের মত যেন একখানি মাটির সর পড়িয়াছে। বন্যার জলে যে মাটি ও অন্যান্য পদার্থ ধুইয়া আসে, ঐ সরখানিতে তাহাই থাকে। ঐ সরখানিকে চলিত কথায় 'পলি' বলে। অতএব যে ক্ষেত্রে পলি পড়ে, চাষাকে সে ক্ষেত্রে সার দিতে হয় না। আবার যে ক্ষেত্রে পচাপাতার সার ভিন্ন অন্য কোন সার দিবার প্রয়োজন নাই, যদি দুই এক বৎসর তাহাতে শস্য রোপণ করা না

যায়, তাহা হইলেও চাষাকে সার প্রস্তুত করিয়া দিতে হয় না। ক্ষেত্র একবার চষিয়া, ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে ঘাস ও আগাছা জন্মে; ঐগুলি শেষে পচিয়া মাটির সহিত মিশে। এই প্রকারে পর পর দুইবার কি তিনবার ঘাস ও আগাছা পচিলে, ক্ষেত্রে বেশ সার জমিয়া যায়।

(পাল্টাপাল্টি চাষ)

সকল উদ্ভিদের খাদ্য এক নহে। ধান গাছ যাহা খায়, কলাই প্রভৃতির গাছ তাহা খায় না। অতএব কোন ক্ষেত্রে ক্রমাগত ধানের চাষ করিলে তাহাতে ধানের গাছের যে খাদ্য থাকে, তাহা শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। কিন্তু ক্রমাগত ধানের চাষ না করিয়া, যদি একবৎসর ধানের চাষ, তাহার পরের বৎসর কলাইয়ের চাষ, তাহার পরের বৎসর আবার ধানের চাষ, তাহার পরের বৎসর আবার কলাইয়ের চাষ, এইরূপ ফিরাইয়া ফিরাইয়া চাষ করা যায়, তাহা হইলে কি ধান গাছের খাদ্য, কি কলাই প্রভৃতি গাছের খাদ্য, কোন খাদ্যই শীঘ্র ফুরায় না। সুতরাং প্রতি বৎসর সার প্রস্তুত করিয়া না দিলেও অনেক দিন বেশ ফসল পাওয়া যায়। ফলতঃ আমাদের দেশের কৃষকেরা অনেক স্থানে এইরূপ পাল্টাপাল্টি চাষই করিয়া থাকে।

(ভূমিকর্ষণ)

শুধু উর্ব্বরা ভূমি হইলেই যে শস্য ভাল হয় এমত নহে। ভূমি কর্ষণ করাও একান্ত আবশ্যক। তোমরা দেখিয়াছ, কৃষকেরা প্রায় সকল শস্যক্ষেত্রই চষিয়া থাকে। কিন্তু কেন চষে, তাহা বোধ হয় জান না। অতএব শুন, কি জন্য শস্যক্ষেত্র চষিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্যান্য গাছের ন্যায় শস্যের গাছও শিকড় দিয়া মাটির ভিতর হইতে খাদ্য টানিয়া লয়। কিন্তু আমরা যেমন হাত দিয়া কোন জিনিস টানিয়া লই, উহারা তেমন করিয়া শিকড় দিয়া রস টানিয়া লইতে পারে না। একটী কাপড়ের সলিতার একদিক জলে ডুবাইয়া রাখিলে দেখিবে যে, সলিতার অপরদিক পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে জলে ভিজিয়া উঠি-তেছে। সলিতা যে প্রকারে জল টানিয়া লয়, গাছের শিকড়ও সেই প্রকারে মাটি হইতে রস টানিয়া লয়। আম, কাঁটাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় বড় গাছের শিকড় মাটির ভিতর অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যথেষ্ট রস টানিয়া আনিতে পারে। অতএব যে স্থানে এ সকল গাছ হয়, সে স্থান চষিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বোধ হয় দেখিয়াছ যে, ঐ সকল বৃক্ষও যখন খুব ছোট থাকে, তখন উহাদের গোড়ার মাটি কোদাল

দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন উহাদেরও শিকড় সরু ও নরম থাকে, সুতরাং শক্ত মাটি ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু শস্যের গাছের শিকড় আরও সরু, আরও নরম, আরও ছোট। গোড়ার মাটি খুব নরম, খুব আল্গা না হইলে, সে শিকড় একেবারেই বাড়িতে পারে না। এদিকে শিকড় একটু বড় হইয়া মাটি ফুঁড়িয়া না গেলেও, মাটি হইতে যথেষ্ট রস টানিয়া লইতে পারে না। এই জন্য শস্যক্ষেত্র চষিয়া, উহার মাটি আল্গা ও নরম করিয়া দিতে হয়।

(লাঙ্গল, গরু প্রভৃতি)

ভূমিকর্ষণ করিবার জন্য লাঙ্গল গরু প্রভৃতি আবশ্যক। লাঙ্গল দিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে হয়, তাহা বোধ হয় জান। লাঙ্গলের যে অংশটুকু লৌহনির্ম্মিত এবং মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকে 'ফাল' বলে। আমাদের দেশে লাঙ্গলের ফাল খুব ছোট। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লাঙ্গল খুব বড়, এবং উহার ফালও খুব বড়। সুতরাং তথাকার ক্ষেত্রের কর্ষণ যত গভীর হয়, এখানকার তত হয় না। সেখানে ঘোড়ায় লাঙ্গল টানে; আমাদের দেশে গরু ও মহিষে টানে।

অতএব বুঝিতে পারিতেছ, গরু ও মহিষ দ্বারা কৃষি-

কার্য্যের কত সাহায্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকেরা গরু ও মহিষকে তত যত্ন করিয়া রাখে না; এমন কি, অনেক সময় পেট ভরিয়া খাইতেও দেয় না। বোধ হয় দেখিয়াছ, চাষাদের গরু প্রায়ই বড় কৃশ হয়। কিন্তু চাষের গরু কৃশ হইলে, চাষ ভাল হয় না; লাঙ্গল জোরে টানা না হইলে, ক্ষেত্রের মাটি ভাল খোঁড়া হয় না; অতএব শস্যও ভাল জন্মে না। যাহারা চাষ করে, চাষের গো মহিষদিগকে যত্ন করা ও ভাল করিয়া খাওয়াইয়া হৃষ্টপুষ্ট করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে, কৃষকদিগেরও বেশ লাভ হয়, দেশের লোকেও বেশী শস্য পায়।

(জল)

চাষের জন্য জলও নিতান্ত আবশ্যক। জল উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। অতএব শস্যক্ষেত্রে জল চাই। আবার জল ভিন্ন উদ্ভিদের অন্য যে সব খাদ্য আছে, সেগুলি প্রায়ই কঠিন পদার্থ। উদ্ভিদ শিকড় দিয়া কঠিন পদার্থ খাইতে পারে না। চিনি কি মিছরি গলিয়া যেমন জলে মিশিয়া যায়, ঐ সকল কঠিন পদার্থ তেমনি গলিয়া জলে মিশিয়া না গেলে, উদ্ভিদ শিকড় দিয়া উহাদিগকে টানিয়া লইতে পারে না। এই জন্যও শস্যক্ষেত্রে জল আবশ্যক।

সকল শস্যের সমান জল আবশ্যক হয় না। এদেশে অন্যান্য শস্যের অপেক্ষা ধানের বেশী জল আবশ্যক। বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া মাটি নরম হয়। সেই জন্য এখানে সচরাচর বৈশাখ মাসেই ধানের চাষ আরম্ভ হয়। আশু বা 'আউশ' ধান শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এবং হৈমন্তিক অথবা 'আমন' ধান অগ্রহায়ণ,পৌষ মাসে পাকে।

ছোলা, মটর, গম প্রভৃতির অধিক জলের প্রয়োজন নাই। বর্ষার পরে ক্ষেত্রে যে রস থাকে তাহা, এবং শীতের শিশির, এই সকল শস্যের পক্ষে যথেষ্ট। অধিক বৃষ্টি হইলে ইহাদের অপকার হয়। শীতের মিঠে রৌদ্রেই ইহারা ভাল জন্মে। এইজন্য ইহাদিগকে রবিখন্দ বলে।

কৃষিকার্য্যের জন্য যত জল আবশ্যক, তাহার বেশীর ভাগই বৃষ্টির জল হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না। বাঙ্গালা দেশে যত বৃষ্টি হয়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তত হয় না। মিশর নামে একটী দেশ আছে, সেখানে দশ পনর বৎসর অন্তর অতি অল্প-মাত্র বৃষ্টি হয়। যেখানে বৃষ্টি কম হয়,সেখানে লোকে কূপ, পুষ্করিণী বা খাল হইতে জল তুলিয়া শস্যক্ষেত্রে সেচন করিয়া থাকে। কিন্তু অনাবৃষ্টি হইলে, কূপাদিও প্রায় শুকাইয়া উঠে। সুতরাং শস্য জন্মিবার সুবিধা হয় না, এবং শস্য না হইলে লোকের অন্নকষ্ট হয়। দেখা গিয়াছে যে এদেশে প্রায় দশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া

অনাবৃষ্টি হয়। তখন শস্য ভাল জন্মে না, খাদ্যসামগ্রীও এত মহার্ঘ্য হয় যে অনেকেই তাহা কিনিতে পারে না; দুঃখী লোকের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয় ও চারিদিকে হাহাকার উঠে। হয়ত অনেকে খাইতে না পাইয়া মরিয়া যায়। এইরূপ অন্নকষ্টকে দুর্ভিক্ষ বলে।

পূর্ব্ব হইতে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, দুর্ভিক্ষের সময় কষ্ট পাইতে বা মরিতে হয় না। এখন এদেশে অনেকে যত শস্য পায়, টাকার লোভে প্রায় সে সমস্তই বিক্রয় করে। কিন্তু বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায়, তাহাও জমাইয়া রাখে না, নানারকমে খরচ করিয়া ফেলে। তাহার পর যখন অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন ক্ষুধার জ্বালায় সপরিবারে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করে। অতএব যাহারা শস্য উৎপাদন করে, তাহাদের কিছু কিছু শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত।

কৃষিকর্ম্মের উপকারিতা।

কৃষিকর্ম্ম হেয় কর্ম্ম নহে। কৃষি ব্যতীত যখন আমাদের প্রাণ ধারণের উপায় নাই, তখন ঘৃণা করিয়া উহা ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। বরং চাকরী ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকর্ম্মে বেশী মন দেওয়া উচিত। সকল লোকের চাকরী মিলে না। অতএব কেবল চাকরী খুঁজিয়া বেড়াইলে অন্ন পাওয়া কঠিন হয়। আমাদের দেশে বিস্তর চাষের যোগ্য ভূমি আছে। সেই সকল

ভূমির মত উর্ব্বরা ভূমি বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই আছে। যত্ন করিয়া সেই সকল ভূমি চাষ করিলে আমাদের কখনই কষ্ট পাইতে হয় না। যদি নিজের জেলায় ভাল জমি পাওয়া না যায়, তবে ভিন্ন জেলায় চাষের যোগ্য ভূমি থাকিলে, তথায় গিয়াও চাষ করা উচিত।

ফলের গাছ।

আহারের নিমিত্ত ধান, গম প্রভৃতি শস্য যত আবশ্যক, আম, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল তত নহে। কিন্তু এই সকল ফল খাইতেও বেশ মিষ্ট এবং খাইলে শরীরের উপকারও হয়। ধান প্রভৃতি শস্য কম জন্মিয়া দেশে অন্নকষ্ট হইলে, অনেক দুঃখী লোকে আম কাঁটাল খাইয়া দুই একমাস প্রাণরক্ষা করে। এই সকল ফল বিক্রয় করিয়াও অনেক লোকের দিনপাতের উপায় হয়। পল্লীগ্রামে এমন অনেক দুঃখিনী বিধবা আছে, যাহারা আপন আপন গাছের নারিকেল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায় তাহাতেই দিনপাত করিয়া থাকে। অতএব যত্ন করিয়া ফলের বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষা করা উচিত।

অধিকাংশ ফলের গাছ বীজ বা আঁটি হইতে জন্মে। অর্থাৎ ফলের বীজ মাটিতে পুতিয়া দিলে সেই বীজ হইতে গাছ বাহির হয়। কিন্তু কোন কোন ফলের গাছ আর এক

প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কোন গাছের একটী ছোট ডালের কোন স্থান একটু চাঁচিয়া, মাটি, চিংড়ি মাছের খোলা ও শাঁস প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের সার তথায় দিন কতক বাঁধিয়া রাখিলে, সেই স্থান হইতে শিকড় বাহির হয়। তখন সেই ডালটি কাটিয়া মাটিতে রোপণ করিলে গাছ হয়। এই প্রকারে যে গাছ হয়, তাহাকে কলমের গাছ কহে। কলমের গাছে অতি অল্প দিনেই ফল জন্মে, এবং সে ফল কখন কখন আঁটির গাছের ফল অপেক্ষা বড় হয়। ফলের গাছ এত অন্তর অন্তর বসান উচিত যেন এক গাছের ডাল আর এক গাছের ডালে না লাগে ; লাগিলে ফল বেশী হয় না।

কলা, বাঁশ প্রভৃতি কতকগুলি গাছ বীজ বা কলম হইতে হয় না। উহাদের ঝাড় হয় ; আর সেই ঝাড়ের পুরাতন গাছের গোড়া হইতে আপনা আপনি নূতন গাছ বাহির হইয়া থাকে। সেই সকল নূতন গাছ অন্য জায়গায় বসাইলেই আবার নূতন ঝাড় হয়।

[প্রাণিজখাদ্য—প্রাণী]

(২)

মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্য। নানা দেশের লোক নানা প্রকার প্রাণিজ খাদ্য খাইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বাস করে। আবার কোন দেশের লোক অল্পসংখ্যক প্রাণীর মাংস খায়, কোন দেশের লোক বহুতর প্রাণীর মাংস খায়। হিন্দুরা সচরাচর মৎস্য ও ছাগমাংস খাইয়া থাকে; গরু, শূকর প্রভৃতি অনেক প্রাণীর মাংস খায় না। মুসলমানেরাও শূকর প্রভৃতি অনেক প্রাণীর মাংস খায় না। ইংরাজ প্রভৃতি জাতি নানাবিধ প্রাণীর মাংস খায়। ইউরোপে অনেকে ঘোড়ার মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেক পণ্ডিত লোকে বলেন যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইলে শরীরে যত তাপ জন্মে, প্রাণিজ খাদ্য খাইলে তদপেক্ষা বেশী তাপ জন্মে। এই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি

শীতপ্রধান দেশের লোক অধিক পরিমাণে প্রাণিজ খাদ্য খাইয়া থাকে। এখন প্রাণি-সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা যাইতেছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণী।

মনুষ্য, গো, অশ্ব, সর্প, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর শরীরে অস্থি বা হাড় আছে। তন্মধ্যে তাহাদের পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে, ঘাড় হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত, কতকগুলি অস্থিখণ্ডের যে একটী যষ্টি থাকে, তাহাকে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া বলে। মেরুদণ্ড আছে বলিয়া এই সকল প্রাণীকে মেরুদণ্ডী প্রাণী কহে। মৎস্যের হাড়কে আমরা সচরাচর কাঁটা বলি, হাড় বলি না।

মাংস নরম বলিয়া, মেরুদণ্ড প্রভৃতি অস্থি থাকিলে শরীরের বাঁধুনি যেমন শক্ত হয়, মেরুদণ্ড প্রভৃতি না থাকিলে তেমন হয় না। কেবল কাদা দিয়া পুতুল গড়িলে পুতুল শক্ত হয় না, সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু কাটি দিয়া হাত পা ও শিরদাঁড়া গড়িয়া, তাহার উপর মাটি দিলে পুতুল শক্ত হয়। সেই জন্য যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে, তাহারা যেমন শক্ত ও বলশালী হয় এবং চলিতে, ছুটিতে বা লাফাইতে পারে, যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড নাই তাহারা তেমন শক্ত ও বলশালী হয় না এবং চলিতে, ছুটিতে বা লাফাইতে পারে না।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শোণিত লাল।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণী।

শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর হাড় নাই। উহাদের শরীরের উপর এক একটী কঠিন আবরণ থাকে ; তাহাতেই ভিতরের কোমল অংশ রক্ষা হয়। সেই আবরণকে চলিত কথায় 'খোলা' বলে। তোমরা শামুক, চিংড়ি ও কাঁকড়ার খোলা দেখিয়াছ। চিংড়ির মেরুদণ্ড নাই। অতএব চিংড়ি মৎস্যজাতীয় প্রাণী নহে।

তোমরা প্রজাপতি, মাছি, বিছা প্রভৃতি প্রাণী দেখিয়াছ। উহাদের শরীরে হাড় নাই, কেবল যেন কয়েকটী করিয়া গাঁইট আছে—যেন দুইটী, তিনটী, চারিটী, কি আরও বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পরস্পর কব্জা দিয়া আঁটা। এই সকল প্রাণীকে গ্রন্থিল অর্থাৎ গাঁইট-বিশিষ্ট প্রাণী কহে।

মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর শোণিত লাল নহে।

স্তন্যপায়ী প্রাণী।

মনুষ্য, পশু প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী সন্তান বা শাবক প্রসব করে। সন্তান বা শাবক জন্মিয়া স্তনদুগ্ধ পান করে। এই জন্য এই সকল প্রাণীকে স্তন্যপায়ী প্রাণী কহে।

অণ্ডজ প্রাণী।

পক্ষী, মৎস্য, সর্প প্রভৃতি শাবক প্রসব

করে না, ডিম্ব প্রসব করে। সেই ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। এই জন্য এই সকল প্রাণীকে অণ্ডজ প্রাণী কহে।

লোকে সচরাচর বাদুড়কে পক্ষী বলিয়া থাকে। কিন্তু বাদুড় পক্ষী নহে। পক্ষীর ন্যায় বাদুড় ডিম্ব প্রসব করে না এবং বাদুড়ের ছানা স্তনদুগ্ধ পান করে। বাদুড়ের শরীরের যে দুইটী অংশকে লোকে উহার ডানা মনে করে, সে দুইটী অংশ ডানা নহে, হাত। কিন্তু ঐ হাত এরূপে গঠিত যে, উহার সাহায্যে বাদুড় উড়িতে পারে।

সমুদ্রে তিমি নামে এক বৃহৎ প্রাণী আছে, লোকে ভ্রম বশতঃ তাহাকে মৎস্য বলিয়া থাকে। তিমি মৎস্য নহে। মৎস্যের ন্যায় তিমি ডিম্ব প্রসব করে না, শাবক প্রসব করে, এবং সে শাবক মাতৃস্তন্য পান করে। মৎস্যের রক্ত শীতল, তিমির রক্ত উষ্ণ।

কুম্ভীর, কচ্ছপ, প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর যে পা আছে, তদ্দ্বারা তাহারা ভাল চলিতে পারে না। সর্পের পা নাই। এই সকল প্রাণী বুকে ভর দিয়া চলে। এই জন্য ইহাদিগকে সরীসৃপ বলে। সরীসৃপের মধ্যে কুম্ভীর ও অনেক প্রকার সর্প বড় ভয়ানক। কুম্ভীর প্রায়ই জলে থাকে এবং সুবিধা পাইলে মানুষ, গরু প্রভৃতি ধরিয়া খাইয়া ফেলে। সর্পের বিষ বড় মারাত্মক। কোন কোন সর্প এত বড় হয় যে ছাগ, মেষ প্রভৃতি গিলিয়া ফেলিতে

পারে এবং গো, মহিষ প্রভৃতি মারিয়া ফেলে। এই সকল সর্পকে অজগর কহে।

পক্ষিগণ পাখার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়। আকাশে উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া উহাদিগকে খেচর কহে।

মৎস্য জলচর। মৎস্যের বুকে, পিঠে ও কাণের নীচে কয়েকখানি ছোট ছোট পক্ষ বা ডানা আছে। সেই ডানা এবং লেজের সাহায্যে উহারা জলের ভিতর সাঁতার দিয়া কীট, উদ্ভিদ প্রভৃতি খাইয়া বেড়ায়।

উষ্ণ ও শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির রক্ত উষ্ণ। উহাদের শরীরের রক্ত বাহির হইবামাত্র স্পর্শ করিলে,উষ্ণ বোধ হইবে। মৎস্য, কুম্ভীর, ভেক, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতির রক্ত শীতল। জীবন্ত মৎস্য কুটিবার সময় যে রক্ত বাহির হয়, তাহাতে হাত দিলে ঠাণ্ডা বোধ হয়। পশু, পক্ষী প্রভৃতির গায়ে হাত দিলে দেখিবে উহা গরম; আর ভেক প্রভৃতির শরীরে হঠাৎ পা লাগিলে দেখিবে, উহা অপেক্ষাকৃত শীতল।

মাংসাশী প্রাণী।

সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে সকল পশু মাংস খায়, তাহাদের পায়ে তীক্ষ্ণ নখ আছে। মাংসাশী পশু বড় উগ্রস্বভাব হইয়া থাকে।

উদ্ভিদভোজী প্রাণী।

হস্তী, গো, মেষ, মহিষ,গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু মাংস খায় না, লতা, পাতা, তৃণ ও শস্য খায়। উহাদের পায়ে সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় নখ নাই, অনেকের খুর আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি রোমন্থন করে, অর্থাৎ ঘাস প্রভৃতি একবার খাইয়া, কিছুক্ষণ পরে তাহা উদর হইতে মুখে আনিয়া, পুনরায় চর্ব্বন করে। রোমন্থন করাকে চলিত কথায় 'জাবর কাটা' বলে। গো, মেষ, ছাগ, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি রোমন্থক প্রাণী।

প্রাণিদেহের আয়তন।

উদ্ভিদ কত বড় হয়, তাহা জান। কতকগুলি প্রাণী বৃহদাকার। হস্তী, সমুদ্রবাসী তিমি, আফ্রিকার উটপাখী খুব বড়। আবার চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না এরূপ ক্ষুদ্র উদ্ভিদও যেমন আছে, প্রাণীও তেমনি আছে। এক বিন্দু জলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী বাস করে। অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে সে সকল প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না।

গৃহপালিত পশু।

উদ্ভিদভোজী পশুগণ মাংসাশী পশু অপেক্ষা শান্ত এবং সহজেই পোষ মানে। এই জন্য লোকে গো, মেষ,

মহিষ, ছাগ, গর্দ্দভ প্রভৃতিকে গৃহে রাখিয়া পালন করে। গৃহপালিত পশু দ্বারা আমাদের বিস্তর উপকার হয়। গো মহিষের দুগ্ধ আমাদের প্রধান খাদ্য। অনেক স্থানে ছাগ, মেষ, উষ্ট্রের দুগ্ধও প্রধান খাদ্য। গো, অশ্ব, গর্দ্দভ আমাদের ভার বহন করে ও গাড়ি টানে। গো মহিষাদি কৃষিকার্য্যে কত আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল পশু আমাদের বড়ই হিতকারী। ইহাদিগকে পবম যত্ন ও স্নেহ সহকারে পালন কবা কর্ত্তব্য; না করিলে পাপ হয়।

কুকুর ও বিড়াল মাংসাশী পশু। কিন্তু উহারা লোকালয়ে থাকিতে ভালবাসে এবং অনেকে উহাদিগা.ক যত্ন করিয়া পোষে।
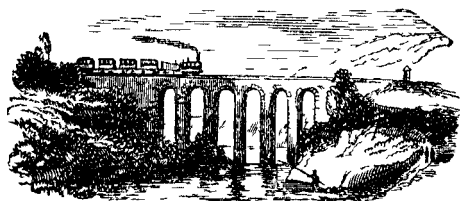
তৃতীয় পাঠ।

[রন্ধনকার্য্য—অগ্নি—পাথুরিয়া কয়লা—
আকর,—ধাতু—হীরক]

রন্ধন কার্য্য।

সকল প্রাণীই আহার করে; কিন্তু মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী রন্ধন করিয়া আহার করে না। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু কাঁচা মাংস খায়; গো, মেষ, মহিষাদি কাঁচা ঘাস খায়; পক্ষিগণ কাঁচা বা পাকা শস্য যাহা পায় তাহা খুঁটিয়াই খাইয়া ফেলে। কেবল মানুষ রন্ধন করিয়া খায়।

অগ্নি।

রন্ধন করিতে হইলে অগ্রে অগ্নি আবশ্যক; এবং অগ্নি জ্বালিতে হইলে কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকে সচরাচর শুস্ক কাষ্ঠ, শুষ্ক পত্র, শুষ্ক গোময়পিষ্টক বা ঘুঁটে দিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ইদানীং কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেক পল্লীগ্রামেও কাষ্ঠ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার চলিতেছে। কারণ ঐ সকল স্থানে কাষ্ঠ অপেক্ষা পাথুরিয়া কয়লার মূল্য কম।

মনুষ্য অগ্নি জ্বালিতে পারে বলিয়া অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে। অগ্নি প্রস্তুত করিতে না পারিলে, অথবা উহার ব্যবহার না জানিলে, মনুষ্যের অবস্থাও পশু পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত হীন থাকিত।

পাথুরিয়া কয়লার আকর।

পাথুরিয়া কয়লাও কাষ্ঠ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বড় বড় বন কোন রকমে বহুকাল মাটি চাপা থাকিলে উহার সমস্ত কাষ্ঠ ক্রমে অত্যন্ত কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে। সেই কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠকে পাথুরিয়া কয়লা বলে। মাটির নীচে যে স্থানে কাষ্ঠ এই প্রকারে কয়লা হইয়া যায়, সেই স্থানকে

কয়লার আকর বলে। মাটির উপর হইতে পথ কাটিয়া কয়লার খনিতে নামিয়া কয়লা তুলিতে হয়। আমাদের দেশে রাণীগঞ্জ, বরাকর, গিরিডিহি প্রভৃতি স্থানে কয়লার আকর আছে।

পাথুরিয়া কয়লায় কেবল যে খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করা হয় তাহা নহে। পাথুরিয়া কয়লায় লোকে ইট পোড়ায়; রেলের কল, জাহাজের কল, ময়দার কল, তৈলের কল প্রভৃতি চালাইবার জন্যও ইহার ব্যবহার হয়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে এক রকম গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ বাহির করা যায়। সেই গ্যাস জ্বলে এবং তাহার আলোক অতিশয় উজ্জ্বল। রাত্রিকালে কলিকাতার রাস্তায় যে গ্যাসের আলো জ্বলে, তাহা পাথুরিয়া কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়।

ধাতু।

পাথুরিয়া কয়লা ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ আকরে পাওয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, সীস, পারদ প্রভৃতি ধাতু খনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এগুলি প্রায়ই অন্যান্য অনেক পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। আকর হইতে তুলিয়া উহাদিগকে নানা উপায়ে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়।

স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়। রৌপ্য শ্বেতবর্ণ। এই দুই ধাতু হইতে উত্তম অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

লৌহ কৃষ্ণবর্ণ। হাতা, বেড়ি, দা, কুড়ুল, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, খন্তা, পেরেক প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী লৌহে নির্ম্মিত হয়।

তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইলে পিতল, এবং রঙ্গ মিশাইলে কাঁসা প্রস্তুত হয়। থালা, ঘটি, বাটি, ঘড়া, গাড়ু প্রভৃতি আমাদের অতি প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী সাধারণতঃ পিতল বা কাঁসায় নির্ম্মিত।

তাম্রপাত্রে খাদ্য দ্রব্য রাখিলে, বা রন্ধন করিলে উহা বিস্বাদ ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই জন্য লোকে তাম্রপাত্র দ্রব রাঙ্ দ্বারা ঢাকিয়া লয়। ইহাকে 'কলাই করা' বলে। পিত্তলের পাত্রে রন্ধন করিলেও তত দোষ হয় না। কিন্তু মাটির পাত্রে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করাই ভাল।

রঙ্গের ইংরাজি নাম টিন্। আমরা যাহাকে টিনের বাক্স বা তোরঙ্গ বলি, বাস্তবিক তাহা রঙ্গ-নির্ম্মিত নহে; রাঙ্ গলাইয়া তাহাতে লোহার পাতলা পাত ডুবাইলে উহা রাঙের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। পরে সেই পাত দিয়া বাক্স বা তোরঙ্গ নির্ম্মিত হয়।

সীস দ্বারা উৎকৃষ্ট লাল ও শাদা রং প্রস্তুত হয়; এবং সীসে রসাঞ্জন মিশাইয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি ছাপাইবার অক্ষর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পারদ সচরাচর তরল অবস্থায় থাকে; এবং অত্যন্ত শীতল না হইলে জমে না। কাচের এক পৃষ্ঠে খুব

পাতলা রাঙের পাত বসাইয়া তাহার উপর পারা লাগাইলে দর্পণ বা আর্শি প্রস্তুত হয়। পারা ও রাঙ মিশিয়া মণ্ডের ন্যায় দর্পণের পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রে মুদ্রা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য অতি নরম ধাতু; এই জন্য মুদ্রা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে অল্প পরিমাণে তামা মিশাইয়া ইহাদিগকে কঠিন করা হয়। স্বর্ণের মুদ্রাকে মোহর বলে। আমাদের দেশে রূপার টাকা, আধুলি, সিকি ও দুয়ানি, এবং তাম্রের ডবল পয়সা, পয়সা, আধপয়সা ও পাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চারি পয়সা বা বার পাইয়ে এক আনা, দুই আনায় দুয়ানি, চারি আনায় সিকি, আট আনায় আধুলি এবং ষোল আনায় টাকা হয়।

হীরক প্রভৃতি।

হীরা, পান্না প্রভৃতি কতকগুলি বহুমূল্য প্রস্তরও আকর হইতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রস্তরকে মণি বা মাণিক্য কহে। এক এক খণ্ড হীরকের মূল্য এত অধিক যে শুনিলে অবাক হইতে হয়।

চতুর্থ পাঠ।

—— —oo— ——
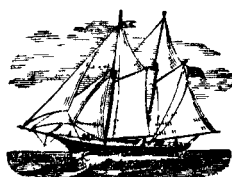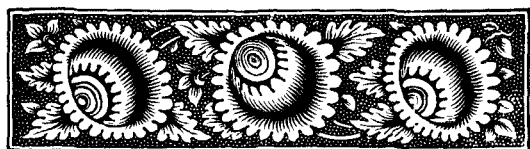
[বাসগৃহ]

ঝড়, বৃষ্টি, হিম, রৌদ্র প্রভৃতি হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্য গৃহের প্রয়োজন। মনুষ্য যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে, অন্য কোন প্রাণী তেমন পারে না। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি অনেক পশু বৃক্ষতলে, বা বড় বড় ঘাসের বনে, বা ঝোপের ভিতর বাস করে। বনে গর্ত্ত বা পর্ব্বতে গুহা পাইলে সিংহ, ব্যাঘ্র তন্মধ্যেও থাকে। বীবর নামে এক জাতীয় পশু

দন্ত দ্বারা বড় বড় গাছ কাটিয়া নদীর ধারে এক রকম গৃহ নির্ম্মাণ করে। খেঁকশিয়াল, বেজী, ইন্দুর প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী মাটির ভিতর গর্ত্তের মধ্যে থাকে। মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণী চাক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। চাকে থলির মত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, তাহাই উহাদের প্রকৃত বাসগৃহ।

কই, মাগুর প্রভৃতি কোন কোন মৎস্য, কচ্ছপ ও কাঁকড়া জলাশয়ে মাটির ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে। সর্প গর্ত্ত করিতে জানে না। তাহারা ইঁদুরের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ইন্দুরগুলি খাইয়া ফেলে, পরে সেই স্থান অধিকার করিয়া লয়।

পক্ষিগণ খড়, কুটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা বৃক্ষের উপর কুলায় নির্ম্মাণ করে। কিন্তু তাহারা বার মাস বাসায় থাকে না; ডিম পাড়িবার সময় আসিলে বাসা নির্ম্মাণ করে; তাহার পর তাহাদের শাবক যখন উড়িতে শিখে, তখন তাহারাও বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় কতদিক হইতে কত পক্ষী বড় বড় গাছে আসিয়া বসে, তাহা দেখিয়াছ। সে সকল গাছে তাহাদের বাসা থাকে না। তাহারা গাছের ডালে বসিয়া রাত্রি যাপন করে, এবং প্রভাত হইলে চারিদিকে উড়িয়া যায়।

সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী মাটিতে ঘাসের

মধ্যে বাসা প্রস্তুত করে। ঈগল প্রভৃতি কয়েকটী বড় পক্ষী উচ্চ পর্ব্বতের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে। ক্ষুদ্র চড়াই পাখী কোটাঘরের কড়ি বরগার ফাঁকের ভিতর বাসা করিয়া প্রায় বারমাসই তথায় থাকে।

আমাদের দেশে বাবুই পাখী বড় সুন্দর বাসা প্রস্তুত করে। অন্যান্য পাখীর বাসা ডালের উপর অথবা ঘাসের ভিতর পাতা থাকে। বাবুইয়ের বাসা গাছে ঝোলে। বাবুই প্রায় খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছেই বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

কিন্তু পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের বাসা মনুষ্যের বাসগৃহের তুলনায় অতি তুচ্ছ। সকল মনুষ্যেরই যে বাসগৃহ আছে, এমত নহে। খুব প্রাচীন কালে, মানুষ অতিশয় অসভ্য ছিল। তখন তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানিত না; নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় গাছের কোটর, পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতি স্থানে বাস করিত। তেমন অসভ্য মনুষ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন অধিকাংশ মনুষ্যই, ভাল হউক, মন্দ হউক, এক রকম না এক রকম গৃহ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে।

পৃথিবীর নানাস্থানে নানাপ্রকার গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীণলণ্ড নামে এক অতি হিমপ্রধান স্থান আছে। সে স্থান বৎসরের মধ্যে দশমাস কাল বরফে

আচ্ছন্ন থাকে। তথায় বৃক্ষাদি অতি বিরল ; যাহা জন্মে তাহাও দশবারহাতের অধিক উচ্চ হয় না। সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা কাষ্ঠাভাবে বরফের দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আমরা যেমন মাটি দিয়া দেয়াল প্রস্তুত করি, তাহারা তেমনি বরফের দেয়াল করে এবং সেই দেয়ালের উপর বরফের খিলান করিয়া দেয়। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে লোকে বড় বড় বৃক্ষের শাখায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। তাহাতে রাত্রিকালে তাহাদের হিংস্র জন্তুর ভয় থাকে না। চীন ও কাশ্মীরের কোন কোন স্থানে, লোকে বারমাসই নৌকায় বাস করে। আরব, তাতার প্রভৃতি দেশে কোন কোন জাতির নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। তাহারা তাঁবু সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং যখন যেখানে সুবিধা পায়, তখন সেইখানে তাঁবু খাটাইয়া বাস করে।

আমেরিকার কোন কোন স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প হইলে অনেক সময় ইষ্টক বা প্রস্তরের গৃহ ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্য সে দেশের অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্ম্মিত। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ খুব কমই আছে; কারণ পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। তাহারা সচরাচর খুঁটি পুঁতিয়া বা দেয়াল দিয়া, তাহার উপর বাঁশের চাল তুলে, এবং ঐ চাল খড়, তালপাতা, গোলপাতা প্রভৃতি দিয়া

ছাইয়া দেয়। ধনী লোকে বড় বড় সুন্দর সুন্দর ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে বাস করে। কলিকাতা, ঢাকা, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বড় বড় নগরে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ অনেক অধিক।
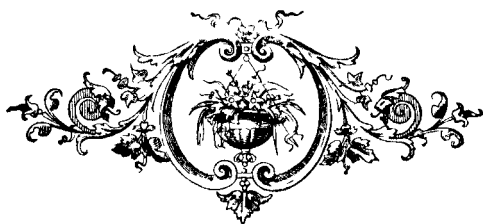
পঞ্চম পাঠ।

[পরিচ্ছদ]

পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে অনেকে ভাল হউক মন্দ হউক, এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন নিকৃষ্ট প্রাণীই কোন রকম পরিচ্ছদ প্রস্তুত কবিয়া পরিধান করিতে পারে না। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে কাহারও গাত্রে মোটা চর্ম্ম, কাহারও গাত্রে বড় বড় লোম, কাহারও গাত্রে পালক, কাহারও গাত্রে শল্ক প্রভৃতি আছে, এই মাত্র। হস্তীর মোটা চর্ম্মে যতটুকু শীতনিবারণ হয়, তদপেক্ষা বেশী শীত সহ্য করিতে হইলে, হস্তীর বড় কষ্ট হয়। ফলতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের পশুপক্ষী হিমপ্রধান দেশে গিয়া থাকিলে

বড় কষ্ট পায়,সময়ে সময়ে মরিয়াও যায়। হিমপ্রধান দেশের পশু পক্ষীও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুস্থ থাকিতে পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এমন কতকগুলি পক্ষী আছে, যাহারা হিমপ্রধান দেশে গিয়া থাকে। কিন্তু হিমপ্রধান দেশে যখন গ্রীষ্মকাল হয় তখনই তাহারা তথায় যায়, এবং শীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফিরিয়া আইসে কিন্তু মানুষ সরু মোটা সকলপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতে পারে বলিয়া, গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও থাকিতে পারে,শীতপ্রধান দেশেও থাকিতে পারে; অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই থাকিতে পারে। এই দেখ ইংরাজেরা হিমপ্রধান দেশের মানুষ হইয়াও আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিতেছে।

বস্ত্র।

মানুষ যখন বস্ত্র প্রস্তুত করিতে জানিত না, তখন হয় উলঙ্গ থাকিত, নয় পশু মারিয়া তাহারই ছাল গায়ে দিত। পশুর ছাল গায়ে দেয় এমন মানুষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যই এখন নানারকমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতেছে। বস্ত্র সচরাচর কার্পাস,

রেশম ও পশম দিয়া প্রস্তুত হয়। পশমের বস্ত্র যত গরম, কার্পাস বস্ত্র তত নহে। এই জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে পশমের বস্ত্র অপেক্ষা কার্পাস বস্ত্র অধিক উপযোগী; আর হিমপ্রধানদেশের পক্ষে কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা পশমের বস্ত্র অধিক উপযোগী।

গুটিপোকা নামক এক প্রকার পতঙ্গ আছে; তাহারা বাসা নির্ম্মাণ করিবার জন্য দুই গাছি সূত্রের ন্যায় লালা বাহির করে। বাতাস লাগিলে উহা শক্ত ও চকচকে হয়। সেই শক্ত চকচকে লালাকেই রেশম বলে। রেশমের বস্ত্রের মূল্য তূলার বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষা প্রায়ই অনেক বেশী। সেই জন্য দুঃখীলোকে রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না।

মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর গায়ে যে লোম হয় তাহাকে পশম বলে। পশমের সূতা কাটিয়া যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার নাম পশমী বস্ত্র। মেষের লোমে কম্বল, বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর দেশে এক প্রকার ছাগল আছে; তাহার লোম খুব সূক্ষ্ম ও চিক্কণ। সেই লোমে শাল প্রস্তুত হয়।

আনারসের পাতা, মসিনার গাছ প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে এক প্রকার সূতা বাহির করিয়া, তদ্দারাও লোকে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পাঠ।

[অলঙ্কার]

পশু, পক্ষী প্রভৃতি কোন নিকৃষ্ট প্রাণী আপন শরীর সাজাইতে পারে না। মানুষ আপন শরীর সাজাইতে এত ভালবাসে, যে অসভ্য অবস্থায়, যখন কোন রকম পরিচ্ছদ পরিতেও শিখে নাই, তখনও লতা, পাতা, ফুল, পাখীর পালক প্রভৃতি দিয়া, বা উল্কী পরিয়া শরীর শোভিত করিত। এখনও পৃথিবীর অনেক স্থানে অসভ্য লোকেরা বণিকদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্ত প্রভৃতি সামগ্রী দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে কাচের মালা, পলার গহনা প্রভৃতি লইয়া তদ্দ্বারা শরীর অলঙ্কৃত করে। অনেক স্থানে কড়ি, শামুক প্রভৃতি দিয়া শরীর সজ্জিত করা হয়। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা যে শাঁকা পরে, তাহা শঙ্খ (শাঁখ) কাটিয়া প্রস্তুত করা হয়। শঙ্খ এক প্রকার শম্বূক।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে অলঙ্কার পরিতে বেশী ভাল বাসে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যত সোণা রূপা

প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত অলঙ্কার পরে, বোধ হয় অন্য কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা তত পরে না। আমাদের দেশে অনেক পুরুষেও অলঙ্কার পরিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই পুরুষে বেশী অলঙ্কার পরে। অঙ্গুরীয়ক পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই স্ত্রীলোকে ও পুরুষে ব্যবহার করিয়া থাকে।

কিছু টাকা ব্যয় করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করা মন্দ নহে। অসময়ে অনেকে অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিন-পাত করিতে পারে। কিন্তু অলঙ্কারের যত ব্যবহার হয়, উহার মুল্য তত কমিয়া যায়। সেই জন্য বেশী টাকার অলঙ্কার করিলে ক্ষতিও বেশী হয়। অতএব অল্প টাকার অলঙ্কার করিয়া, বাকী যত টাকা থাকিবে, তদ্দারা কোন ব্যবসায় করিয়া আরও অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত।

শরীর সাজাইবার জন্য মানুষ কেবল যে সোণা রূপার গহনা পরে, তাহা নহে। ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল জুতা প্রভৃতিও পরে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকেরা গহনা কম পরে বটে, কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা সচরাচর বহুমূল্যের কাপড় বেশী ব্যবহার করে। কাপড় কিনিতে যত টাকা লাগে, কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে সে সমস্তই নষ্ট হয়। অতএব সৌখিন কাপড় কি সৌখীন জুতা পরিয়া বেশী টাকা নষ্ট করিও না।

সপ্তম পাঠ।

[শিল্প]

শিল্প কাহাকে বলে, শুন। বারইয়ারিতে লোকে কত সং প্রস্তুত করে। খড়ে দড়ি বাঁধিয়া, হাত পা গড়িয়া, তাহাতে মাটি লেপিয়া দেয়; তাহার পর মাটির মুখ বসাইয়া শেষে রং মাখায়। এই প্রকারে সং প্রস্তুত করা এক রকম শিল্প। তোমরা খেলা করিবার জন্য মাটি দিয়া হাত, পা, পেট, মুখ গড়িয়া যে পুতুল কর, সে পুতুল গড়াও এক রকম শিল্প। রথ-তলায় কি চড়ক-ডাঙ্গায় তোমরা যে সব মাটির কুকুর, মাটির বিড়াল, মাটির খোকা, কাঠের হুকা, টিনের পাল্কী, শোলার ফুল প্রভৃতি ক্রয় কর, তাহা প্রস্তুত করাও শিল্প। অতএব বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, একটী,

কি দুইটী, কি তিনটী, কি আরও বেশী দ্রব্য লইয়া তদ্দ্বারা অন্য একটী দ্রব্য প্রস্তুত করার নাম শিল্প।

ধান, গম প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষি-কার্য্য কত আবশ্যক তাহা বুঝিযাছ। কিন্তু কৃষিকার্য্য করিবার জন্য, অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া খাইবার জন্য এবং গৃহ, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিবার জন্য শিল্প কত আবশ্যক তাহা এখন বুঝান যাইতেছে।

(লাঙ্গল প্রভৃতি)

লাঙ্গল না হইলে শস্যক্ষেত্র কর্ষণ করা যায় না। ..স্য-ক্ষেত্রে ঘাস বা আগাছা জন্মিলে নিড়ানী দিয়া তাহা তুলিয়া ফেলিতে হয়। কাস্তে না হইলে শস্য কাটা যায় না। কোদাল না হইলে ভূমি খনন করা যায় না। অত-এব কৃষিকার্য্যের জন্য লাঙ্গল, নিড়ানী, কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্র একান্ত আবশ্যক। লোহা পোড়াইয়া, পিটিয়া, নানা রকম করিয়া গড়িয়া কর্ম্মকার এই সকল অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। কৃষক তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্য করে। অতএব কর্ম্মকার যে শিল্প কর্ম্ম করে, তাহা কত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছ।

(হাঁড়ি, হাতা, বেড়ি প্রভৃতি)

কুম্ভকার মাটি দিয়া চাকে হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি গড়িয়া

তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া বিক্রয় করে। আমরা সেই হাঁড়ি, সরা কিনিয়া তাহাতে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করি।

রন্ধন করিবার জন্য হাতা, বেড়ি, খুন্তি প্রভৃতিও আবশ্যক। কর্ম্মকার লোহা পোড়াইয়া পিটিয়া হাতা, বেড়ি প্রভৃতি গড়ে। তরকারি, মৎস্য প্রভৃতি কুটিবার জন্য বঁটির প্রয়োজন। কর্ম্মকার লোহা পোড়াইয়া বঁটি গড়িয়া তাহাতে কাঠের বা লোহার বাঁট লাগাইয়া বিক্রয় করে। তাই আমরা মাছ, তরকারি কুটিতে পারি।

(ধুচুনী, চুপড়ী প্রভৃতি)

চাল, তরকারি ভাল করিয়া ধুইয়া রন্ধন করিতে হয়; নচেৎ ভাতে ও ব্যঞ্জনে ধূলা, বালি, কীট প্রভৃতি থাকিতে পারে। অপরিস্কার অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলে পীড়া হয়। ডোম বাঁশ কাটিয়া, চাঁচিয়া তদ্দ্বারা ধুচুনি, চুপড়ী বা পেতে, প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। আমরা তাহা দ্বারা চাল, তরকারি উত্তম রূপে ধুইয়া লই। ডোমের শিল্পে আমাদের কত উপকার হয় দেখ।

(থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি)

পানভোজনাদির নিমিত্ত থালা, ঘটি, বাটি, রেকাব প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কাঁসারীরা পিতল কাঁসা প্রভৃতি গলাইয়া, ঢালিয়া ও পিটিয়া এই সকল পাত্র প্রস্তুত

করিয়া বিক্রয় করে; লোকে কিনিয়া তাহাতে পান ভোজনাদি সম্পন্ন করে। মুর্শিদাবাদ জেলায় খাগড়া নামক একটী স্থান আছে। সেখানকার কাঁসার জিনিস অতি উৎকৃষ্ট। কটকের কাঁসাও প্রসিদ্ধ। ধনী লোকে সোণা রূপার থালা, গেলাস, বাটি প্রভৃতি ভোজনপাত্ররূপে ব্যবহার করে। কিন্তু ঐ সকল পাত্র কাঁসারীরা প্রস্তুত করে না, স্বর্ণকারে প্রস্তুত করে।

ধনীলোকে উৎকৃষ্ট শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের ভোজন-পাত্রও ব্যবহার করে। ঐ সকল পাত্র জয়পুর, গয়া প্রভৃতি স্থানে নির্ম্মিত হয়।

এখন বুঝিতেছ ডোম, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, কাঁসারী প্রভৃতি যে সকল শিল্পকার্য্য করে, তদ্দারা আমাদের কত উপকার হয়। তাহারা আপন আপন কার্য্য না করিলে, আমাদের রন্ধন ভোজনাদি নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিত।

গৃহ প্রভৃতি।

খড়, মাটি, দরমা, দড়ি, খুঁটি প্রভৃতি দিয়া কাঁচা ঘর নির্ম্মাণ করা হয়; এবং চূণ, সুরকি, কড়ি, ইট, বরগা প্রভৃতি দিয়া পাকা ঘর প্রস্তুত হয়। অতএব কাঁচা ঘরও শিল্প-কার্য্য, পাকা ঘরও শিল্পকার্য্য। আবার ঘর প্রস্তুত করিতে দড়ি, দরমা, কবাট, জানালা প্রভৃতি যে যে দ্রব্য

আবশ্যক তাহা প্রস্তুত করাও এক একটি শিল্প। চূণারা চূণ প্রস্তুত করে। গড়নদার বা ইটের মিস্ত্রীতে ইট প্রস্তুত করে, সূত্রধর কবাট,জানালা প্রস্তুত করে, ইত্যাদি। অতএব একখানি ঘর বা বাড়া প্রস্তুত করিতে কত শিল্পের আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিতেছ।

বস্ত্র।

তুলা পিঁজিয়া সূতা কাটিতে হয়; পরে সেই সূতা তাঁতে বুনিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। অতএব তূলার বস্ত্র প্রস্তুত করাও একটী শিল্প। এইরূপ রেশমী ও পশমী বস্ত্র বয়ন করাও শিল্প। তন্তুবায় প্রভৃতি যাহারা বস্ত্র বয়ন করে, তাহাদের শিল্পকার্য্যে লোকের কত উপকার হয় তাহা বুঝ।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প চিরপ্রসিদ্ধ। তথায় পূর্ব্বে এক প্রকার সুন্দর সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। উহা রাত্রিকালে ঘাসের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখিলে, শিশিরে ভিজিবার পর, বস্ত্র রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইত না, মনে হইত ঘাসের উপর কেবল শিশির পড়িয়া রহিয়াছে। সে কাপড়ের মূল্যও খুব বেশী ছিল। এখন তেমন কাপড় কেহ ক্রয় করে না, সেই জন্য প্রস্তুতও হয় না। কিন্তু ঢাকায় এখনও যে রকম উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়, পৃথিবীর অন্য কোথাও সে রকম হয় না

বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

কাশ্মীরে উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হয়। তেমন শাল পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হয় না।

অলঙ্কার।

পিতল, কাঁসা, সোণা, রূপা প্রভৃতি গলাইয়া, পিটিয়া, তার ও পাত করিয়া, অলঙ্কার প্রস্তুত করাও শিল্প। যখন সকল লোকেই অল্প বিস্তর অলঙ্কার ভালবাসে, তখন অলঙ্কার নির্ম্মাণও অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য।

শিল্পকর্ম্মের উপকারিতা।

আরও অনেক শিল্প আছে। সে সকল শিল্পের কথা তোমরা পরে শিখিও। এখন যাহা শিখিলে তাহাতে বুঝিতে পারিতেছ যে শিল্প না হইলে মানুষের চলে না, এবং মানুষ শিল্প কার্য্য করিতে পারে বলিয়া পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা এত উন্নত হইতে পারিয়াছে। ডোম, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণ লোকের কত উপকার করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অষ্টম পাঠ।

[বাক্‌শক্তি—ভাষা—লেখা—ছাপা—
বুদ্ধি—ধর্ম্মভাব]

বাক্‌শক্তি।

মানুষ কথা কহিতে পারে, অন্য কোন প্রাণী পারে না। তোমার ক্ষুধা হইলে তুমি তোমার মাকে ডাকিয়া বলিতে পার, 'মা, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাবার দাও। কিন্তু তোমার বাড়ীর পোষা বিড়াল, কি পাখী ক্ষুধায় কাতর হইলে কখন বলিতে পারে না, 'ওগো, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাবার দাও'। পশু,

পক্ষী প্রভৃতি ভয় পাইলে এক রকম শব্দ করে, আহ্লাদ হইলে আর এক রকম শব্দ করে, কোন রকম কষ্ট বা যাতনা পাইলে আর এক রকম শব্দ করে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বাক্‌শক্তি বা কথা কহিবার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে, আর কোন প্রাণীর নাই*। শালিক, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পক্ষীকে অভ্যাস করাইলে দুই চারিটী কথা কহে বটে, কিন্তু যে কথাগুলি কহে তাহার অর্থ বুঝে না। একটী শালিককে যদি 'কাল জল' এই দুইটী কথা বলিতে শিখাও, তাহা হইলে শালিক ঐ দুইটী কথা বলিতে শিখিবে। যদি জিজ্ঞাসা কর, কে আসিয়াছে, তাহা হইলেও শালিক বলিবে 'কাল জল'; আর যদি জিজ্ঞাসা কর, ছাতু খাবি, তাহা হইলেও শালিক বলিবে 'কাল জল'। ইহাতেই জানা যায় যে পাখী যে কথাগুলি কহিতে শিখে তাহার অর্থ বুঝে না।

ভাষা।

আমাদের মনে কোন ভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইলে,

* পণ্ডিতেরা বলেন যে বানরেরা যে সকল শব্দ করে তাহার অর্থ তাহারা পরস্পর বুঝিতে পারে। কিন্তু সে সকল শব্দ যে পরিস্ফুট নহে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ আমাদের মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা হইলে, কতকগুলি কথা কহিয়া তাহা প্রকাশ করি বা মুখ ফুটিয়া বলি। সেই সকল কথার সমষ্টিকে ভাষা কহে। তোমার ইচ্ছা হইল শ্যাম তোমাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যায়। এই ইচ্ছাটী প্রকাশ করিবার জন্য তুমি বলিলে "শ্যাম, তুমি আজ আমাকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া চল"। আমার মনে হইল তোমাকে জানাই যে "তুমি আজ বিলম্ব করিয়া পাঠশালায় গিয়া ভাল কাজ কর নাই; গুরুমহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।" এই ভাবটী প্রকাশ করিবার জন্য আমি বলিলাম "নবীন, তুমি আজ অনেক বেলায় পাঠশালায় গিয়াছিলে বলিয়া গুরু মহাশয় তোমার উপর রাগ করিয়াছেন"। এইরূপ মনের সব রকম ভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য যে সমস্ত কথা কহিতে হয় তাহার সমষ্টিকে ভাষা কহে। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, সকলে এক ভাষায় কথা কহে না। আমরা বাঙ্গালী জাতি; আমরা যে ভাষায় কথা কহি, তাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা ইংরাজ জাতি, উহারা যে ভাষায় কথা কহে, তাহাকে ইংরাজী ভাষা বলে। পৃথিবীতে নানা ভাষা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার খুব নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভাষায় অনেক শব্দ আছে।

সংস্কৃত ভাষায় কত শব্দ আছে, নির্ণয় করা কঠিন। বড় বড় ইংরাজী অভিধানে আশি পঁচাশি হাজার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এমন ভাষাও আছে, যাহাতে দুই তিন শতের বেশী শব্দ নাই।

লেখা।

মানুষের যে কেবল বাক্‌শক্তি আছে এমত নহে, তাহারা লিখিতেও পারে। কথা কহিতে হইলে আমাদের মুখ হইতে যে সকল শব্দ বাহির হয়, সেই সকল শব্দের এক একটী সঙ্কেত বা চিহ্ন আছে। "মা" বলিয়া ডাকিলে প্রথম যে শব্দটী বাহির হয় তাহার চিহ্ন (ম্) এবং শেষ যে শব্দ বাহির হয় তাহার চিহ্ন (আ) বা (া)। এই সকল চিহ্নকে বর্ণ বা অক্ষর বলে। সমস্ত অক্ষর লইয়া বর্ণমালা হয়। এ সকল কথা তোমরা জান। কারণ তোমরা বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছ।

মানুষ শব্দের চিহ্ন প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া, লিখিতে পারে, নচেৎ লিখিতে পারিত না। আর লিখিতে না পারিলে মানুষ বেশী শিখিতেও পারিত না। সমুদ্র ও কোন কোন নদীতে জোয়ার ভাটা হয়; অর্থাৎ প্রতিদিন দুইবার করিয়া জল বাড়ে, ও দুইবার করিয়া কমে। কেন এ রকম হয়, মানুষ শীঘ্র বুঝিতে পারে

না—অনেক দিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে তবে বুঝিতে পারে। মনে কর, রাম কুড়ি বৎসর চেষ্টা করিয়া বুঝিল কেন জোয়ার ভাটা হয়; কিন্তু যাহা বুঝিল তাহা লিখিয়া রাখিল না। লিখিয়া রাখিল না বলিয়া, অধিক লোকে জোয়ার ভাটার কারণ জানিতে পারিল না। কিন্তু রাম যদি লিখিয়া রাখিত, তাহা হইলে সেই লেখা পড়িয়া অনেকে সহজেই তাহা জানিতে পারিত; তাহাদিগকে আবার বিশ, পঁচিশ বৎসর চেষ্টা করিয়া জানিতে হইত না। আর সহজে ও শীঘ্র জানিতে পারিয়া তাহারা অন্য অন্য বিষয়ও শিখিবার সময় পাইত। অতএব বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে মানুষ লিখিতে পারে বলিয়া কতই জানিতে পারে, কতই শিখিতে পারে। মানুষ এত জানিতে ও শিখিতে পারে বলিয়াই অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধি ও ক্ষমতায় এত উন্নত।

ছাপা।

লিখিতে পারে বলিয়া মানুষের শিখিবার কত সুবিধা, তাহা বুঝিলে। কিন্তু পুস্তক ছাপিতে পারে বলিয়া মানুষের শিখিবার আরও অধিক সুবিধা হয়। মনে কর, কুড়ি হাজার বালক ধারাপাত পড়িবে। তাহাদের সকলকে এক একখানি ধারাপাত দিতে হইবে। অতএব কুড়ি হাজার ধারাপাত চাই। যদি কুড়ি হাজার

ধারাপাত হাতে লিখিয়া দিতে হইত, তাহা হইলে কত সময় ও পরিশ্রম লাগিত বল দেখি। হয়ত সেই কুড়ি হাজার বালকের অনেকদিন পড়া বন্ধ থাকিত, এবং ধারাপাত প্রস্তুত হইলে বালকগুলিকে এক একখানি ধারাপাত হয়ত দুই টাকা কি তিন টাকা দিয়া কিনিতে হইত। কিন্তু মানুষ এখন পুস্তক ছাপিতে শিখিয়াছে। ছাপা এত শীঘ্র হয় যে, এক দিন, কি দুই দিনে কুড়ি হাজার ধারাপাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অতএব পুস্তক প্রস্তুত হইল না বলিয়া শিশুদিগের এখন আর পড়া বন্ধ থাকে না। আবার ছাপিবার ব্যয়ও এত কম যে, এক একখানি ছাপা ধারাপাতের মূল্য এক আনার বেশী নয়। পুস্তকের মূল্য কম হইলে দুঃখী লোকের সন্তানেরাও পুস্তক কিনিয়া পড়িতে পারে।

অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে মানুষ পুস্তক ছাপিতে পারে বলিয়া তাহার জানিবার ও শিখিবার যত সুবিধা হইয়াছে, ছাপিতে না পারিলে তত সুবিধা হইত না।

বুদ্ধি।

মানুষের যেমন বুদ্ধি আছে, অন্য কোন প্রাণীরই তেমন নাই। মাথায় কাপড় জড়াইলে মাথায় রৌদ্র

লাগে না; ঘরের চাল কি ছাদ করিয়া দিলে ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল পড়ে না; নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিলে সহজেই নদী পার হওয়া যায়। বুদ্ধি আছে বলিয়া মানুষ এই সকল বুঝিতে পারিয়াছে। শীত কেন হয়; গ্রীষ্ম কেন হয়; শস্য কেমন করিয়া হয়; সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ কেন হয়; নদীতে জোয়ার ভাটা কেন হয়; কি করিলে মানুষ ধার্ম্মিক হয়; এই সকল বিষয় বুঝিবার ক্ষমতাকেও বুদ্ধি বলে। এ ক্ষমতা অন্য প্রাণীদিগের এত অল্প, যে নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। দেখ, পাখী গাছে বাসা করিয়া তাহার মধ্যে থাকে। বৃষ্টি হইলে সে বাসা ভিজিয়া যায়, এবং পাখীও বাসায় বসিয়া ভিজিতে থাকে। কিন্তু বৃষ্টি হইলে বাসায় জল না পড়ে, পাখী এমন করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিতে কখনই পারিল না। বাবুই পক্ষীরা বাসা সুন্দর করে বটে, কিন্তু বেশী বৃষ্টি হইলে তাহাও ভিজিয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাখী যেমন করিয়া বাসা গড়িত, এখনও ঠিক তেমনি করিয়া গড়িতেছে*। বীবর নামক পশু জলের ভিতর মাটি ও কাঠ দিয়া গৃহ প্রস্তুত করে, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে রকম গৃহ নির্ম্মাণ করিত, এখনও ঠিক সেই রকম করিতেছে; বোধ হয়

---

* কদাচিৎ কোন পক্ষীকে তদপেক্ষা ভাল করিয়া গড়িতে দেখা যায়।

সহস্র সহস্র বৎসর পরেও ঠিক সেই রকম করিবে। ইহার কারণ এই যে, পশু পক্ষী প্রভৃতির বুদ্ধি বড় কম, এবং সে বুদ্ধি চিরকাল প্রায় একই রকম থাকে। কেবল, যে সকল পশু মানুষের দ্বারা পালিত, তাহাদের বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বাড়িতে দেখা যায়।

অন্য প্রাণীর অপেক্ষা মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশী, এবং মানুষের বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া থাকে। মানুষ যে ঘরে থাকে, সে ঘরে বৃষ্টির জল পড়িলে, কি রৌদ্র প্রবেশ করিলে, মানুষ এমন করিয়া ঘর মেরামত করিতে পারে, যে তাহাতে আর বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, রৌদ্রও প্রবেশ করিতে পারে না। দেখ, মানুষ এক সময়ে কি রকম কদর্য্য ঘরে বাস করিত; আর এখনইবা কেমন ভাল ভাল বাড়ীতে বাস করিতেছে। পল্লীগ্রামে দুঃখীদিগের কত ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, এবং ধনী লোকদিগের কেমন বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এক সময়ে নদী পার হইতে ভয় পাইত; এখন জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে হাঁটিয়া হাঁটিয়া যে পথ দুই মাসে চলিত এখন রেল গাড়িতে সেই পথ দুই দিনে অতিক্রম করিতেছে।

ধর্ম্মভাব।

অন্য প্রাণীদিগের বুদ্ধি মানুষের ন্যায় বেশী নহে বটে,

কিন্তু উহাদের যে, বুদ্ধি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের যে ধর্ম্মভাব আছে, উহাদের তাহা একেবারেই নাই। মানুষ ঈশ্বরকে ভক্তি করে, ঈশ্বরকে পূজা করে, অন্য কোন প্রাণীই তাহা করে না। কোন পশু, বা কোন পক্ষীকে কখনও ঈশ্বরের পূজা করিতে দেখিয়াছ কি? ঈশ্বর আছেন বলিয়াও পশু, পক্ষী প্রভৃতির বোধ নাই। মানুষের মনে ঈশ্বরকে ভক্তি করিবার ও পূজা করিবার যে ইচ্ছা আছে, তাহাকেই ধর্ম্মভাব কহে।

মানুষ ঈশ্বরকে পূজা করিতে এতই ভালবাসে যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া পূজাগৃহ নির্ম্মাণ করে। হিন্দুদিগের পূজাগৃহের নাম মন্দির বা ঠাকুর বাড়ী; মুসলমানদিগের পূজাগৃহের নাম মস্‌জিদ; খৃষ্টানদিগের পূজাগৃহের নাম গির্জ্জা।

মানুষের ন্যায়-অন্যায় এবং হিতাহিত জ্ঞানও আছে। গরু দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে একটী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে অনেক শস্য নষ্ট হইল। শস্য নষ্ট হওয়াতে কৃষকের যে অহিত হইল গরুর সে বোধ নাই। কিন্তু যে মানুষ ধার্ম্মিক, সে এমন কাজ করে না; কারণ সে বুঝে যে শস্য নষ্ট করিলে কৃষকের অনিষ্ট করা হয়। তুমি একটি মাছ হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছ। একটা

চিল আসিয়া ছোঁ মারিয়া তোমার হাতের মাছটী কাড়িয়া লইয়া গেল। ইহাতে যে তোমার প্রতি অন্যায় করা হইল, চিলের সে বোধ নাই। কিন্তু মানুষ ধার্ম্মিক; সে জানে যে, এমন করিয়া পরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে চুরী করা হয় এবং পাপ হয়। যে মানুষ পরের অহিত করে সে বড় পাপী—সে পশু, পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।

নবম পাঠ।

[পরিবার—প্রতিবেশী—স্বগ্রামবাসী—
স্বদেশবাসী—মনুষ্যজাতি—
সমাজ - রাজা]

পরিবার।

পক্ষিশাবক যত দিন উড়িয়া বেড়াইতে না পারে ততদিন বাসায় পিতামাতার কাছে থাকে ; কিন্তু উড়িতে পারিলেই পিতা মাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পশুশাবকেরা যত দিন আপনারা আহার সংগ্রহ

করিয়া খাইতে না পারে, ততদিন তাহাদের মাতার কাছে থাকে; অনেক পশুশাবক তাহাদের পিতাকে কখনই জানিতে পারে না। অনেক মৎস্যে কেবল যে পিতাকে চেনে না তাহা নহে, মাতাকেও চেনে না। মৎস্যের ডিম্ব হইতে নূতন মৎস্য হয়। তুমি মৎস্যের ডিম্ব কিনিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দাও; সেই ডিম্ব হইতে মৎস্য উৎপন্ন হইবে। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ সেই সকল মৎস্য তাহাদের মাতাকে কখন দেখিতেও পাইবে না।

মনুষ্য পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া, একত্র থাকে। এইরূপে থাকাকে পবিবার বদ্ধ হইয়া থাকা বলে। পিতামাতা পুত্রকন্যাকে কত ভালবাসেন তাহা জান। পুত্র, কন্যা পিতামাতাকে কত ভালবাসে ও ভক্তি করে তাহাও জান। পৌত্র, পৌত্রী, পিতামহ পিতামহীর বড়ই আদরের সামগ্রী। পৌত্র ও পৌত্রী পিতামহ পিতামহীকে কত ভালবাসে ও ভক্তি করে, তাহা কি আর তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে? তোমাদেরও ত ভাই ভগিনী আছে। তোমরা তাহাদিগকে কত ভালবাস। আর তাহারাও তোমাদিগকে কত ভালবাসে। এই জন্যই মানুষ পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, ভাই, ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়া পরিবার-

বদ্ধ হইয়া থাকে। গৃহ বড় স্নেহ ভক্তির স্থান। পরিবারে যাঁহারা ভক্তির পাত্র, তাঁহাদিগকে ভক্তি করিও; যাহারা স্নেহের পাত্র তাহাদিগকে স্নেহ করিও। আর পিতামহ, পিতামহী, পিতামাতা প্রভৃতি যাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য, প্রাণপণ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিও।

প্রতিবেশী।

মানুষের কেবল যে পিতামাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আপনার লোকগুলিকে লইয়া একত্র থাকিতে ইচ্ছা হয়. তাহা নহে; যাঁহারা পিতামাতা প্রভৃতির ন্যায় আপনার নহেন, তাঁহাদিগকেও নিকটে লইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তোমাদের বাড়ীর পার্শ্বে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা যদি অন্য কোন স্থানে গিয়া, বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় বাস করেন, কিংবা দুই মাস কি তিন মাসের জন্য অন্য কোন স্থানে যান, তাহা হইলে তোমাদের কত কষ্ট হয় বল দেখি। তাঁহাদের দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্রের সঙ্গে তোমাদের কত 'ভাব' ছিল। তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে, তাহাদের সঙ্গে বসিয়া লেখা পড়া করিতে, তোমরা কত ভাল

বাসিতে। তাহারা এখন চলিয়া গিয়াছে। তোমাদের মনে কত কষ্ট হইতেছে বল দেখি। কোন ব্যক্তিকে যদি এক গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া, আর এক গ্রামে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে নূতন গ্রামের যে অংশে অপর লোকের বাড়ী আছে, সে সেই অংশেই আপন বাড়ী নির্ম্মাণ করে, সেখান হইতে অধিক দূরে নির্ম্মাণ করে না। ইহার কারণ এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ অন্য মানুষের কাছে থাকিতে ভাল বাসে। ইহার আরও একটী কারণ আছে। যাঁহারা নিকটে বাস করেন, অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিবেশী, তাঁহারা অনেক উপকার করেন। তোমাদের বাড়ীতে বিবাহ। বিবাহের জন্য অনেক আয়োজন করিতে হইবে। সেই সমস্ত আয়োজন করিতে পারে, এত লোক তোমাদের বাড়ীতে নাই। তোমাদের প্রতিবেশীরা আসিয়া কেহ হাট করিয়া দিলেন, কেহ বিবাহের সভা সাজাইয়া দিলেন। আবার প্রতিবেশীর বাড়ীতে কাহারও কঠিন পীড়া হইয়াছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে গ্রামান্তর হইতে বৈদ্য ডাকিয়া আনিতে হইবে। তাঁহার বাড়ীতে এমন লোক নাই যে বৈদ্য ডাকিয়া আনে। তোমরা গিয়া বৈদ্য ডাকিয়া আনিলে। তাহাতে তোমাদের বিপন্ন প্রতিবেশীর বড়ই উপকার হইল।

অতএব যখন বুঝিতে পারিতেছ যে, পরিবারবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে প্রতিবেশীর সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক,

তখন প্রতিবেশীকে ভালবাসিও, প্রতিবেশীর উপকার করিও, প্রতিবেশীর সহিত কলহ করিও না। অনেকে প্রতি- বেশীর সহিত কলহ করিয়া আপনাদেরই অনিষ্ট করে।

(স্বগ্রামবাসী)

মানুষের শুধু প্রতিবেশীকে লইয়া থাকিলেও চলে না। তোমরা পূর্ব্বের পাঠ সমূহ পড়িয়া বুঝিয়াছ যে, মানুষের অনেক দ্রব্যের প্রয়োজন। আহার করিবার জন্য শস্য আবশ্যক; রন্ধন করিবার জন্য হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি আবশ্যক; গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য কবাট, জানালা, কড়ি, বরগা প্রভৃতি আবশ্যক; পরিধান করিবার জন্য বস্ত্র আবশ্যক; ইত্যাদি। অতএব যাহারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারা যায় না। এই জন্য প্রায় সকল পল্লীগ্রামেই চাষাপাড়া, কুমারপাড়া, কামারপাড়া, তাঁতিপাড়া প্রভৃতি অনেক পাড়া আছে। গ্রামের সকল লোকেই পরস্পরের উপকার করে। অতএব সকলেরই পরস্পরকে পরম হিতকারী বুঝিয়া ভালবাসা, ও পরস্পরের হিতসাধন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

(স্বদেশবাসী)

আবার কেবল আপনার গ্রামবাসীগুলিকে লইয়া থাকিলেও মানুষের চলে না। মানুষের যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, সে সমস্তই যে স্বগ্রামে পাওয়া যায় এমত নহে। শ্যামের গ্রামে ঘৃত পাওয়া যায়, কিন্তু আলু পাওয়া যায় না। রামের গ্রামে আলু পাওয়া যায়, কিন্তু ঘৃত পাওয়া যায় না। অতএব আলুর প্রয়োজন হইলে, শ্যামকে আপন গ্রাম ছাড়িয়া রামের গ্রামে গিয়া আলু ক্রয় করিতে হয়। আর ঘৃতের প্রয়োজন হইলে, রামকে আপন গ্রাম ছাড়িয়া শ্যামের গ্রামে গিয়া ঘৃত ক্রয় করিতে হয়। আহারাদির জন্য থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি আবশ্যক। অনেক গ্রামে থালা, ঘটি, বাটি কিনিতে পাওয়া যায় না। অতএব অনেক গ্রামের লোককে দূরস্থ হাট বা নগর হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। যে জেলায় তোমাদের বাড়ী, সে জেলায় যদি দুর্ভিক্ষ হয়, তবে অন্য জেলা হইতে চাল আসিলে তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়। দুর্ভিক্ষ না হইলেও, যে জেলায় চাল সস্তা, সেই জেলা হইতে চাল আনিতে হয়, নচেৎ টাকায় কুলায় না। নগরে চাল জন্মে না, সেখানে অন্য স্থান হইতে চাল আসে। শুধু চাল কেন, সকল সামগ্রীই এইরূপে আমদানি করিতে হয়। অতএব দেখ,

কেবল আপনার আপনার গ্রামবাসীগুলিকে লইয়া থাকিলে কেহ সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সমস্ত স্বদেশবাসীর সাহায্য লইতে হয়, সমস্তদেশবাসীকে লইয়া থাকিতে হয়।

আর একটী কথা বলি শুন। রামের বাড়ী হুগলী জেলায়; রামের মাতার পিত্রালয় হয়ত যশোহর জেলায়; খুড়ীমাতার পিত্রালয় হয়ত রঙ্গপুর জেলায়; এবং ভগিনীর শ্বশুরবাড়ী হয়ত মুর্শিদাবাদ জেলায়। অর্থাৎ বিবাহ করিতে হইলে, আমাদিগকে শুধু যে আপনার আপনার গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহা নহে; সময়ে সময়ে আপনার আপনার জেলা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দূর জেলাতেও যাইতে হয়। গৃহ কত সুখের স্থান তাহা জান। আর পরিবারের মধ্যে জননী কত স্নেহময়ী ও শুভকারিণী তাহাও জান। কিন্তু তোমার ঐ জননী হয়ত কত দূর জেলা হইতে তোমাদের গৃহে আসিয়াছেন। হয়ত তোমার বাড়ী ঢাকা জেলায়, আর তোমার মামার বাড়ী হুগলী জেলায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বল দেখি, হুগলী জেলায় তোমার মামা, মামী, মাতামহী প্রভৃতি কত আপনার লোক আছেন! অতএব শুধু স্বগ্রামবাসী-গুলিকে লইয়া থাকিলে চলে না। এই জন্য বলি, সমস্ত স্বদেশবাসীকে ভাল বাসিও।

(মনুষ্যজাতি)

কিন্তু মানুষের যাহা যাহা আবশ্যক, সে সমস্তই যে স্বদেশে পাওয়া যায় তাহা নহে। ইংরাজেরা রুটী খায়। রুটী খাইতে হইলে গম আবশ্যক। কিন্তু ইংরাজদের দেশে বেশী গম হয় না। সেই জন্য ইংরাজদিগকে আমাদের দেশ হইতে বা অন্য দেশ হইতে গম লইয়া যাইতে হয়। আবার আমাদের দেশে লবণ এখন এত অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয় যে, ইংরাজদের দেশ হইতে লবণ না আসিলে আমাদের চলে না। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে, ইংরাজেরাও আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আমরাও ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব মানুষের যেমন কেবল স্বগ্রামবাসীকে লইয়া থাকিলে চলে না, তেমনি অনেক সময়ে কেবল স্বদেশবাসীকে লইয়া থাকিলেও চলে না; অন্যান্য দেশের লোককে অথবা সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া থাকিতে হয়।

আবার পশু, পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় কেবল পানভোজন করিলেই যে মনুষ্য জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করা হয়, তাহা নহে। মানুষের বিদ্যা শিক্ষা

করা আবশ্যক, জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞান যে কোন একটী দেশে আছে, অন্য কোন দেশে নাই, এমন নহে। পূর্ব্বকালে ইউরোপ হইতে পণ্ডিতেরা আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়া কত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যাইতেন। এখনও ইউরোপের অনেক লোক আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কত শিক্ষা করিতেছেন। আর আমরাও এখন ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপবাসীদিগের লিখিত গ্রন্থ পড়িয়া কত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছি; এবং তাহাদের কল কারখানা দেখিয়া কল কারখানা করিতে শিখিতেছি। অতএব বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, মানুষকে শুধু স্বদেশবাসীকে লইয়া থাকিলে চলে না, সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া থাকিতে হয়, সমস্ত মানবজাতির সাহায্য লইতে হয়।

এইজন্য বলি, সকল মনুষ্যকেই ভালবাসা উচিত, কোন মানুষকেই ঘৃণা করা উচিত নহে। যিনি হিন্দু তাঁহার কোন মানুষকে খৃষ্টান বলিয়া, কি মুসলমান বলিয়া ঘৃণা করা অকর্ত্তব্য। যিনি মুসলমান তাঁহার কোন মানুষকে হিন্দু বলিয়া, কি খৃষ্টান বলিয়া ঘৃণা করা অকর্ত্তব্য। যিনি খৃষ্টান তাঁহার কোন মানুষকে হিন্দু বলিয়া, কি মুসলমান বলিয়া ঘৃণা করা অকর্ত্তব্য। যিনি তোমার স্বদেশবাসী নহেন, তাঁহাকে বিদেশবাসী বলিয়া ঘৃণা করিও

না। যিনি তোমার মত পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া অন্যরকম পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কিম্বা তুমি যে দ্রব্য ভক্ষণ কর না সেই দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাঁহাকেও ঘৃণা করিও না।

পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি লইয়া থাকাকে যেমন পরিবারবদ্ধ হইয়া থাকা বলে, তেমনি প্রতিবেশীকে লইয়া, স্বগ্রামবাসীকে লইয়া, স্বদেশবাসীকে লইয়া, বা সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া থাকাকে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা বলে। প্রতিবেশীকে লইয়া যে সমাজ, তাহা অতি ক্ষুদ্র; তাহার নাম পল্লীসমাজ। স্বগ্রামবাসীকে লইয়া যে সমাজ, তাহা পল্লীসমাজ অপেক্ষা বড় এবং তাহার নাম গ্রাম্যসমাজ। স্বদেশবাসীকে লইয়া যে সমাজ, তাহা গ্রাম্যসমাজ অপেক্ষাও বড় এবং তাহার নাম দেশীয় অথবা জাতীয়সমাজ। সমস্ত মনুষ্যকে লইয়া যে সমাজ, তাহা দেশীয় বা জাতীয় সমাজ অপেক্ষা বড় এবং তাহার নাম মনুষ্যসমাজ।

(সমাজ)

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, মানুষ কি জন্য সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। খাদ্য সামগ্রী, গৃহ, রন্ধনপাত্র, পানপাত্র, বস্ত্র প্রভৃতি মানুষের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক,

কোন মানুষই একাকী সে সমস্ত প্রস্তুত করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহাদের পরস্পরের সাহায্য লইতে হয়। কৃষক যদি শস্যোৎপাদন না করে, তাহা হইলে কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি কেহই খাইতে পায় না। আবার কুম্ভকার যদি হাঁড়ি প্রস্তুত না করে, তাহা হইলে কৃষক, কর্ম্মকার প্রভৃতি কেহই ভাত রাঁধিয়া খাইতে পারে না। কৃষক, কি কুম্ভকার, কি কর্ম্মকার, কি অপর কেহ যদি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে গ্রামের অপর সকল লোককেই অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং পরস্পরের সাহায্য লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য মানুষকে একত্র থাকিতে হয়। এই অভিপ্রায়ে মানুষ যখন একত্র হইয়া থাকে, তখনই মানুষের সমাজ হয়, নতুবা সমাজ হয় না। রথ কি চড়ক দেখিবার জন্য, অথবা বারইয়ারির যাত্রা শুনিবার জন্য অনেক মানুষ এক স্থানে জড় হয়। তখন তাহারা পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য জড় হয় না; এবং সেই জন্য তাহাদের মধ্যে কেহ সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে, অবশিষ্ট লোকগুলিকে কোন কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতেও হয় না। অতএব রথতলায়, কি বারইয়ারিতলায়, কি চড়কডাঙ্গায় অনেক মানুষ জড় হইলে, মানুষের সমাজ হয় না, জনতা বা ভিড় হয় মাত্র।

হস্তী, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি কতকগুলি পশুকে দল-

বদ্ধ হইয়া বেড়াইতে দেখা যায়। টিয়া প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পক্ষীকে ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কিন্তু হস্তী প্রভৃতির দল সমাজ নহে, পক্ষী বা মৎস্যের ঝাঁকও সমাজ নহে। হস্তী প্রভৃতি প্রাণী পরস্পরের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য মনুষ্যের ন্যায় সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে না। তোমাদের গ্রামের মাঠে দুই শত গরু চরিতেছে। তন্মধ্যে কুড়িটা গরু সে মাঠ ছাড়িয়া অপর কোন মাঠে গিয়া চরিতে লাগিল। তোমাদের মাঠে যে গরুগুলি রহিল সেগুলি যেমন চরিতেছিল তেমনি চরিতে লাগিল। তাহাদের চরিয়া খাইবার কোন ব্যাঘাত হইল না। প্রকৃত সমাজ কেবল মানুষেরই আছে। মানুষ পরস্পরের সাহায্য লইবার নিমিত্ত সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, আপন অবস্থার এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

বীবর, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি গুটিকতক প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে গৃহ নির্ম্মাণ, আহার সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্য করে বটে; কিন্তু উহারা চিরকালই ঐ কয়েকটী কার্য্য করিতেছে, অন্য কোন কার্য্য করিতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ থাকে বলিয়া যেরূপ নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে পারে, উহারা সেরূপ পারে না। অতএব উহাদের সমাজকে প্রকৃত সমাজ বলা যায় না।

রাজা।

সকল মনুষ্যের চরিত্র সমান নহে। কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক; কেহ সাধু, কেহ অসাধু; কেহ শান্ত, কেহ দুর্দ্দান্ত। সকল দেশেই মন্দলোক আছে। মন্দলোকে চুরী করে, ডাকাইতি করে, প্রতারণা করে, ছলে বলে পরের দ্রব্য কাড়িয়া লয়, অন্যান্য দোষও করে। ইহাদিগকে দমন না করিলে সমাজে শান্তি থাকে না; লোকে নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পারে না; উপার্জ্জিত বিষয় ভোগ করিতে পারে না; এমন কি রাত্রিতে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারে না। সমাজের দুষ্ট লোকের শাসন করিয়া, শিষ্ট লোকের হিতসাধন করিবার জন্য রাজা আবশ্যক। রাজা আদালত প্রভৃতি স্থাপন করিয়া এবং শান্তিরক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া, দুষ্ট লোকের শাসন করেন। দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে রাজা অন্নদান করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করেন। কোন শত্রু দেশ আক্রমণ করিলে, রাজা তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশ রক্ষা করেন। এই সকল কার্য্য করিবার জন্য রাজাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিয়া রাজা সেই অর্থ সংগ্রহ করেন।

রাজা প্রজার পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। আমাদের রাজ-রাজেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়াকে আমরা কত ভালবাসি ও ভক্তি করি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।